শেষ পৃষ্ঠা | বৃহস্পতিবার | রেজিঃ রাজঃ ২৬৬ | গাইবান্ধা বর্ষ ১৭, সংখ্যা ২৬০ | ১ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা | ১৩ রবিউস সানি ১৪৪৬ হিজরি | পৃষ্ঠা ৪ মূল্য ৩ টাকা | ১৭ অক্টোবর ২০২৪ ইং

দৈনিক মাধুকর
news portal: Madhukar.news www.emadhukar.com

আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস ২০২৪

“ন্যায় শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের জন্য একসাথে কাজ করা, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অপব্যবহার বন্ধ করা”

‘Ending Social and Institutional Maltreatment Acting together for just, peaceful and inclusive societies’

বিশেষ ক্রোড়পত্র

SKS এসকেএস ফাউন্ডেশন

কর্মসংস্থান সৃষ্টিই হোক দারিদ্র্য বিমোচনের পথ!

আজ ‘আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস’। জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রতিবছরই সারা বিশ্বে দিবসটি পালিত হয়। বিশ্বজুড়ে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও মানুষের অসমতা দূর করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করা দিবসটির মূল লক্ষ্য। ফ্রান্সভিত্তিক এনজিও এটিডি ফোর্থ ওয়ার্ল্ডসহ তাদের অতি দারিদ্র্য দূরীকরণ আন্দোলনের সফলতায় ১৭ অক্টোবর আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস পালনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯২ সালের ২২ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৪৭/১৯৬ রেজুলেশনের মাধ্যমে ১৭ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। আমাদের দেশেও দিবসটি গুরুত্বের সাথে পালিত হয়। দারিদ্র্য বিমোচন দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য “Ending Social and Institutional Maltreatment Acting together for just, peaceful and inclusive societies” বা ন্যায় শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের জন্য একসাথে কাজ করা, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অপব্যবহার বন্ধ করা।’

দারিদ্র্য শুধু সম্পদের অভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ক্ষুধা, মৌলিক সুবিধার অভাব ও সহিংসতা ইত্যাদি দারিদ্রকে আরও প্রকট করে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিদ্যমান দারিদ্র্য এক জটিল ও বহুমাত্রিক সমস্যা, যার উদ্ভব জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিসরে। দারিদ্র্য বিমোচনের কোনো একক উপায় নেই। এজন্য প্রয়োজন দেশকে স্বীয় অবস্থা বিবেচনা করে নিজস্ব কর্মসূচি নির্ধারণ। সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক সহায়তাদানের মাধ্যমে তাদের এ সমস্যা উত্তরণে সাহায্য করা।

বিশ্বের সবচেয়ে নিষ্ঠুর হত্যাকারী ও ভোগান্তির উৎস হচ্ছে দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের কারণে শিশুরা ভ্যাকসিন থেকে বঞ্চিত। বিশুদ্ধ পানির অভাবে অসংখ্য শিশু মারা যাচ্ছে। কার্যকর ওষুধ ও চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রতিবছর অগণিত মা সন্তান জন্মদানকালে মারা যাচ্ছে। কমছে আয়ুষ্কাল, বাড়ছে পঙ্গুত্ব ও প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা। দারিদ্র্যের কারণে বাড়ছে মানসিক অসুস্থতা, বিষন্নতা, আত্মহত্যা ও পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা।

দারিদ্র্য মানবাধিকারের পথেও বড় বাধা। দারিদ্র্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে পরিবেশ সংরক্ষণে। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণে নির্ধারণ করা প্রয়োজন স্বল্প মেয়াদি কৌশল। উন্নয়ন, টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের বিষয়গুলোকে সমাধান করতে হবে সমন্বিতভাবে। এ কৌশলের লক্ষ্য হবে টেকসই উন্নত জীবনযাত্রার জন্য সবাইকে সহায়তা প্রদান, আয় বৃদ্ধি, সম্পদের স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করে মানবসম্পদ উন্নয়নের নীতি গ্রহণ।

একজন মানুষের মর্যাদা সব মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে নিশ্চিত হয়। অনেক মানুষ দিনের পর দিন দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে; ফলে মানুষ হিসেবে তাদের মর্যাদাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। জাতিসংঘের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, দারিদ্র্যের অবসান, পৃথিবীকে রক্ষা এবং সর্বত্র সব মানুষ শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার অঙ্গীকার নিয়ে ২০৩০ সালের এজেন্ডা আবারও একই প্রতিশ্রুতির কথা বলছে, যা মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় ছিল। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা হলো ১.৩ বিলিয়ন মানুষ এখনও বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে, যাদের প্রায় অর্ধেক শিশু এবং যুবক। আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং দারিদ্র্যের সামাজিক ও পরিবেশগত কারণগুলো সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করে।

নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার পাশাপাশি এসকেএস ফাউন্ডেশনও নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস ২০২৪ পালন করছে। এসকেএস ফাউন্ডেশন তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কাজে সম্পৃক্ত হয়ে তাদের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নের চেষ্টা করছে। বিশেষকরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীরা পুরুষের পাশাপাশি বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আত্মনির্ভরশীলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক কর্মসূচির পাশাপাশি এসকেএস নানামুখী সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। গৃহীত সামাজিক উদ্যোগসমূহ যেমনঃ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদনসহ মানবিক উন্নয়নে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে, একইভাবে এই উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এসকেএস বিশ্বাস করে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ আরও বিস্তৃত করে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। এ লক্ষ্যে এসকেএস ফাউন্ডেশন বিদ্যমান কর্মসূচি অব্যাহত রাখার পাশাপাশি আরও নতুন নতুন সহায়ক উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

রাসেল আহম্মেদ লিটন
নির্বাহী প্রধান
এসকেএস ফাউন্ডেশন

গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসে প্রস্তাবনা

আশরাফুল আলম

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের সীমাহীন দারিদ্র্য নতুন কোনো বিষয় নয়। বরং এই দেশের গ্রাম এবং শহরে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য আমাদের চোখে পড়ে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতিতে নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হচ্ছে এবং দারিদ্র্যের ঘাত নতুন নতুন রুপে দৃশ্যমান হচ্ছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের বাস্তবতা হচ্ছে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ মানুষ এখনো দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। গ্রাম বাংলার দারিদ্র্য পীড়িত পরিবারগুলো মূলত সম্পদ বঞ্চিত। এদের কৃষি জমি নেই। অকৃষি স্থায়ী সম্পদ আছে। এখানে যাদের পর্যাপ্ত কৃষি জমি নেই তাদের ৮০ ভাগ মানুষ দরিদ্র্য। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে দারিদ্র্য একটি বঞ্চনার কাহিনী যা জীবনধারণের ন্যূনতম চাহিদার সাথে সংশ্লিষ্ট। বাংলাদেশের দারিদ্র্য মূলত গ্রাম কেন্দ্রিক। গ্রামীণ দারিদ্র্য গ্রাম উন্নয়নের ঠিক বিপরীত একটি শব্দ।

বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্য স্থানীয় অর্থনৈতিক উপাদান-সমূহের সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বলতে এমন পরিস্থিতি বোঝায় যেখানে নগরহীন প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী লোকেরা এমন অবস্থায় থাকে বা জীবনযাপনের জন্য আর্থিক সংস্থান এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সেবাসমূহের অভাব বিদ্যমান। যেখানে মানুষের ৫টি মৌলিক চাহিদা যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান,স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার সংকট থাকে। তবে এই সংকট গ্রাম অথবা শহরেও থাকতে পারে। আমাদের সমাজে অর্থ-সম্পদ কারণে কিছু মানুষ সমাজে অনেক উঁচুতে অবস্থান করে, আবার কিছু মানুষ শুধু বেঁচে থাকার জন্য কোনো রকম খেয়ে না খেয়ে বেঁচে থাকে।

বর্তমানে বাংলাদেশের গ্রাম-এলাকায় দারিদ্র্য পরিস্থিতি শহরের তুলনায় খারাপ। শহুরে প্রাপ্ত প্রযুক্তিগত সুবিধা এখনো অনেক গ্রামে পৌঁছায়নি। এমনকি এখনো অনেক গ্রাম আছে যেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি! আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গ্রামে এখনো সঠিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত হয়নি। বিভিন্ন অসুবিধার কারণে বেশিরভাগ ডাক্তাররাই গ্রামে যেতে চায় না। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম অপ্রতুল। সুতরাং গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য যেসকল সেবা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন তার অনেকগুলোই প্রত্যন্ত গ্রামে গুনগত সেবা দিতে ব্যর্থ। প্রতি বছরে কোনো না কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মূখীন হয়ে তাদের জীবনের গতি মন্থর হয়ে যায়। ফলে তারা চলমান দারিদ্র্য অতিক্রম করতে পারে না।

২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি’র ১নং লক্ষ্য দারিদ্র্য বিমোচন। টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন এবং তৎপরবর্তী আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার পরেও আশানুরূপ ফল দেখা যাচ্ছে না। দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করলেও দেশের মানুষের একটি বড় অংশই দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে। এখনও দেশের প্রান্তিক শ্রমিক, দিনমজুর, কৃষক, ভ্যান চালক, রিকসা চালক, দৈনিক শ্রমিক, গৃহপরিচারিকা, পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর বিভিন্ন নিম্ন আয়ের মানুষ অস্বাস্থ্যকরভাবে দেখা যায়। এমন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা নেয়া গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্য দূরীকরণে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রত্যাশিত কর্মসূচি গ্রহণ জরুরি। এখানে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের পথে হাটতে হলে সকলের শ্লোগান হওয়া উচিত ‘লাভের জন্য নয় সেবার জন্য উদ্যোগ।’

বিগত সময়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি সহায়ক নীতি ও কৌশল এবং ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণের ফলে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশ। উল্লেখ্য ২০১৬ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী দারিদ্র্য এবং অতি দারিদ্র্যের হার ছিল যথাক্রমে ২৪.৩ শতাংশ এবং ১২.৯ শতাংশ। এসডিজি-১ শুধুমাত্র চরম দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্যই নয় বরং ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যকে এর সমস্ত মাত্রায় অর্ধেকে নামিয়ে আনার আহ্বান। উন্নয়ন বাজেটের আওতায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি- সরকারি উদ্যোগে দারিদ্র্য নিরসনে আদর্শ গ্রাম, সমন্বিত মৎস্য কর্মসূচি, পশু সম্পদ উন্নয়ন, আত্মকর্মসংস্থান, গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান, কৃষি বহুমূখীকরণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান, সামাজিক ক্ষমতায়ন, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, পল্লী বিদ্যুতায়ন, গ্রামীণ স্যানিটেশন বাস্তবায়ন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম, মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, পল্লী মাতৃসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে জনসংখ্যা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসে ইতিবাচক অগ্রগতি হলেও দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের সফলতা লাভের জন্য কয়েকটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করছি। যেমন-
(১) ধনী গরিবের মাঝে বিদ্যমান ব্যাপক বৈষম্য দূর করা, (২) যেকোনো মূল্যে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, (৩) জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচনের বাস্তবমুখী নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে তা স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা, (৪) কর্মমূখী ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা, (৫) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, (৬) আইনের শাসন, সুবিচার, সুশাসন ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা, (৭) স্থানীয় ও জাতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা, (৮) তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বল্প মূল্য ও সহজীকরণ করা, (৯) গ্রামীণ কৃষিতে আর্থিক প্রণোদনা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং (১০) গ্রামীণ প্রতিটি দরিদ্র পরিবারের চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে দৈনন্দিন আয়ের একটি বড় অংশই খরচ করতে হয়। তাই স্থানীয় পর্যায়ে দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া।

দারিদ্র্য বাংলাদেশের একটি জটিল মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। যা বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই উপযুক্ত এবং যৌক্তিক পদক্ষেপ সঠিক উপায়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে নাগরিক জীবনের মান উন্নয়ন হলেই দারিদ্র্য হ্রাস।

বাল্যবিবাহ দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ

মোদাচ্ছেরুজ্জামান মিলু

আজ আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস। এই দিবসটি নিশ্চয়ই পৃথিবীর নানা দেশে উদযাপিত হচ্ছে। প্রতিবছরই দারিদ্র্য কমিয়ে আনতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অনেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়, অনেক আলোচনা ও প্রবন্ধ ছাপা হয় বিভিন্ন পত্রিকায়। আলোচনায় দারিদ্র্যের কারণ নিয়ে যেমন আলোচনা হয় তেমনি দারিদ্র্য থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে অর্থনৈতিকভাবে সক্ষমতা অর্জনের অনেক সুপারিশ নিয়েও আলোচনা হয়। কিন্তু বাল্যবিবাহ যে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ সে বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব সহকারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে দেখা যায় না। আমি বলবো বাল্যবিবাহ বাংলাদেশে দারিদ্র্যের একটি অন্যতম কারণ এবং এই ব্যাধি দূর করতে হলে সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাল্যবিবাহ নিরোধে আইন থাকলেও সে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নেই। আইনে বাল্যবিবাহকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক কোনো নারী বা পুরুষ অপ্রাপ্ত বয়স্ককে বিয়ে করলে তা বাল্যবিবাহ হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক কেউ অপরাধ করলে সর্বোচ্চ ২ বছর কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হবেন। এই আইন ২০১৭ সালের ৬নং আইন এবং বিয়ের বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ছেলেদের কমপক্ষে ২১ বছর এবং মেয়েদের কমপক্ষে ১৮ বছর। কিন্তু এই আইনে বেশ বড় ফাঁক রয়েছে, যেখানে কায়দা-কৌশল করে নির্ধারিত বয়সের আগেও বিয়ে দিয়ে সেই বিয়ে জায়েজ করা যায়। কি সেই ফাঁক? আইনের এক জায়গায় বলা হয়েছে বিশেষ ক্ষেত্রে এবং সর্বোত্তম স্বার্থে আদালতের নির্দেশে ও বাবা-মায়ের সম্মতিতে যে কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের এবং ছেলের বিয়ে হতে পারবে। তারমানে কোনো ব্যক্তি যদি একজন ৭/৮ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে তবে গ্রামের মাতবরের ইচ্ছা অনুযায়ী মা-বাবার মান-সম্মান যাবে এই ভয় দেখিয়ে ধর্ষণের বিচার না করে বরং সেই ধর্ষকের সাথে বিয়ে দিয়ে আজীবন গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হয় আজীবন ধর্ষণ করার জন্য। এই বিষয়গুলি নিয়ে সকলের মনে ভাবনা চিন্তা ঢুকিয়ে দেওয়া হলো যাতে করে সকলে ভেবে দেখেন বাস্তবতাটা কোথায়।

আমাদের দেশে কোনো বাল্যবিবাহের ঘটনা ঘটলে নারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি। একজন কিশোরীকে ক্লাস সেভেন বা ক্লাস এইটে বিয়ে দেওয়া হয়। আমরা প্রতিবছর ঈদের পর স্কুল খোলার পর দেখতে পাই বেশ কয়েকজন কিশোরীর বিয়ে হয়ে গেছে। এই কিশোরীদের আজীবনের জন্য লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। তার দরিদ্র পরিবারে একদিকে যেমন সে শিক্ষিত হয়ে নিজের পরিবারের ভাই-বোনদের লেখাপড়া শেখাতে পারতো তেমনি চাকুরি করে পরিবারের দারিদ্র্য কমিয়ে স্বচ্ছল পরিবার বানাতে পারতো। বাল্যবিবাহের পর আমরা সমাজে আরেক ভয়ানক চিত্র দেখতে পাই। অপ্রাপ্ত বয়সের কিশোরীকে বিয়ে দেওয়ার ১ বছরের মাথায় সেই কিশোরী গর্ভবতী হয়। তাই সন্তান প্রসবের সময় নানান জটিলতা দেখা দেয়। অন্যদিকে গ্রামের কিছু অশিক্ষিত মানুষের কুবুদ্ধিতে সন্তান প্রসব হাসপাতাল বা ক্লিনিকে না করিয়ে বাসা-বাড়িতেই প্রসব করার জন্য সিদ্ধান্ত নেন। এ ক্ষেত্রে মায়ের যেমন জীবনের ঝুঁকি তেমনি সন্তানেরও জীবনের ঝুঁকি থেকে যায়। এমনও দেখা গেছে যে সন্তান প্রসবের সময় মা এবং সন্তান দুজনেই মারা গেছে। যদি দেখা যায় ভাগ্যক্রমে মা ও সন্তান উভয়েই বেঁচে গেছেন তখন পরবর্তী সমস্যা দেখা দেয় মায়ের শারীরিক নানা সমস্যা। জন্মের পরে সন্তান অপুষ্ট হওয়ার কারণে চিকিৎসার জন্য পরিবারের গরু-ছাগল, সম্পদ বা জমি বিক্রি করতে হয়। এভাবেই বাল্যবিবাহের ফলে মানুষ আরো গরীব হয়ে যায়। দারিদ্র্য এভাবে দিনের পর দিন বৃদ্ধি পায়।

দেশে প্রতি বছর কতটি বাল্যবিবাহ হয় সে হিসাব নিয়ে কারো মাথা ব্যাথা নেই। তবে এতটুকু বলবো সকলে চোখ-কান খোলা রেখে আপনার গ্রামেই খোঁজ নিয়ে দেখুন এবং আপনার সঠিক বিবেচনা ও জরিপে দেখবেন যে বাল্যবিবাহের চিত্র কতটা ভয়ানক। আমাদের দেশে নারী অধিকারভিত্তিক অনেক দিবস পালিত হয় যেমন প্রতি বছরের ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হয় যাকে আমরা সিক্সটিন ডেজ অ্যাকটিভিজম হিসেবে বলে থাকি। তাছাড়া ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয় প্রতিবছর। এই সমস্ত দিবসে বাল্যবিবাহের কারণ, কুফল এবং আমাদের করণীয় বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়। কিন্তু দিবস চলে গেলে কোনো অগ্রগতি বা চাওয়া-পাওয়ার প্রতিশ্রুতি সকলে ভুলে যায়। ১১ অক্টোবর চলে গেল আন্তর্জাতিক কন্যা দিবস। এই দিবসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পত্রিকায় এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেছে। ১১ অক্টোবরে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায় দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার সবচেয়ে বেশি। ২০১৯ সালে ইউনিসেফের একটি জরিপের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে ৫১ শতাংশ তরুণীর বিয়ে হয়েছিলো তাদের শৈশবে। এ ধরনের অনেক জরিপ আছে যা উল্লেখ করলে ভয়াবহ চিত্রই দেখা যাবে বার বার।

বাল্যবিবাহ কেন বন্ধ করা যাচ্ছে না? এর উত্তর পেতে হলে আমাদেরকে আরো গভীরে চিন্তা করতে হবে। বর্তমান সমাজে নারীর নিরাপত্তা নিয়ে অভিভাবকসহ সমাজের সকলেই উদ্বিগ্ন। আমার মেয়েকে কোনো মাস্তান পার্টি জোর করে নিয়ে যেতে পারে, আবার কোথাও যৌন হয়রানির শিকার হতে পারে। এই সমস্ত কারণে মা-বাবা মান-সম্মানের ভয়ে মেয়েদের বাল্যবিবাহ দিতে বাধ্য হয়। এদিকে ঘটক ও কাজির কারণেও অনেক বাল্যবিবাহ হয়ে থাকে। একটি মেয়ের ১৮ বছর বয়স হয় নাই অথচ ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কম বয়সের মেয়েদের ১৮ বছর বানিয়ে হাজার হাজার ভূয়া জন্ম সনদ দেয়া হয়েছে। খুব ভালোভাবে সততার সাথে যাচাই করলে গোটা বাংলাদেশের চিত্র দেখা যাবে একই রকম।

ইউনিয়ন পরিষদ কেন ভূয়া সার্টিফিকেট দেয়? এর সহজ উত্তর হচ্ছে সার্টিফিকেট না দিলে ভোটের সময় ঐ পরিবারগুলির ভোট না পাওয়ার ভয়। সরকার যদি কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করে তবে বাল্যবিবাহ অবশ্যই প্রতিরোধ করা সম্ভব। জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সুপারিশ করেছিলাম যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কনসার্ন ছাড়া কোনো বিয়ে হবে না। এতে করে ইউএনও মহোদয় কোনো এক উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাকে দিয়ে যাচাই সাপেক্ষে প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিয়ের অনুমতি দেবেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা? অনেকে মনে করেন এমনি করে দিন যদি যায় যাক না। শেষে বলবো বাল্যবিবাহ জাতির অগ্রগতির জন্য বড় বাধা। বাল্যবিবাহের কারণেই সেই পরিবারগুলো দিনের পর দিন আরো গরীব হচ্ছে। তাই দেশের দারিদ্রতা দূর করতে হলে বাল্যবিবাহ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে।

চাকুরি হারানোর ভয় নেই গোলাপ মিয়ার

প্রদীপ রায়

রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার বড় হজরতপুর ইউনিয়নের সেরুডাঙ্গা গ্রামের ছেলে মো. গোলাপ মিয়া। কৃষিতে ডিপ্লোমা পাস করার পর তিনি স্থানীয় একটি এগ্রোকেমিক্যাল ফার্মে কাজ শুরু করেন। ক্যারিয়ারের অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি তিনি স্থানীয় থেকে জাতীয় এবং জাতীয় থেকে বহুজাতিক কোম্পানিতে কাজ করেন। নিজের কাজ এবং ক্যারিয়ার নিয়ে তিনি ছিলেন খুবই সন্তুষ্ট।

কিন্তু তার উজ্জ্বল ক্যারিয়ারটি ধ্বংস হয় COVID-19 মহামারীতে। চাকুরি হারিয়ে গ্রামের বাড়িতেই তিনি বুকে আশা সঞ্চার করে দিন গুনেন চাকুরি ফিরে পাওয়ার। কিন্তু দিন যায়, তার আর চাকুরিতে ডাক আসেনা। কয়েকমাস পড়ে থাকার পর তিনি চাকুরি খোঁজা শুরু করেন। কিন্তু তিনি কোনো চাকুরি পেলেন না। অবশেষে এক বন্ধুর মধ্যস্থায় তিনি একটি ড্রাগন ফলের বাগানে ম্যানেজার হিসেবে চাকুরি পান। বেতন তেমন না হওয়ায় তিনি নতুন চাকুরিতে খুব খুশি ছিলেন না, তবে তিনি শিখলেন নতুন কিছু এবং এখানেই ড্রাগন ফল চাষের লাভজনক ব্যবসা আবিষ্কার করলেন। “মালিকেরা বাগানে তেমন আসতেন না; তবুও মাস শেষে তারা ভালো মুনাফা পেতেন। কেউ যখন সরাসরি তদারকি না করেও, ভালো আয় করেন, তখন আমি নয় কেন!

যেখানে কৃষিতে আছে আমার ডিপ্লোমা, ড্রাগন ফল চাষ ও বিপণনে সরাসরি অভিজ্ঞতা হয়েছে! আমি যে মুনাফা তৈরি করছি অন্যের জন্য, সেখানে নিজের জন্য নয় কেন?” গোলাপ মিয়ার এমন চিন্তা এবং আত্মবিশ্বাস তাকে ঠেলে দেয় নিজের ড্রাগন বাগান শুরু করার দিকে।

COVID-19 মহামারী দীর্ঘায়িত হওয়ার এবং একটি ভালো চাকুরি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসায় তিনি ভালো চাকুরির আশা ছেড়ে দেন। মুনাফায় আর অন্যদের সহায়তা নয়, নিজেই হয়ে ওঠেন উদ্যোক্তা।

গ্রাম থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে তিনি ২১০ শতক জমি লিজ নেন এবং সেখানে ৭০০ ড্রাগন চারা রোপণ করেন। বাগানের নিবিড় তদারকি করার জন্য তিনি তার বাড়িটিও বাগানের পাশে স্থানান্তর করেন। কিন্তু বাগানটি করার সময় তিনি ছিলেন অর্থ সংকটে। এসকেএস ফাউন্ডেশন-এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির এক কর্মী তাকে এসকেএস ফাউন্ডেশন ঋণ পেতে সহায়তা করে। শুধু তাই নয়, তার বাগানটির কারিগরি বিষয়গুলো দেখার জন্য এসকেএস ফাউন্ডেশন-এর কৃষিবিষয়ক বিভাগ থেকে প্রতিনিয়ত পরামর্শ পেয়েছেন। এভাবে নিজের একান্ত প্রচেষ্টায় এবং এসকেএস ফাউন্ডেশন-এর সহায়তায় গোলাপ মিয়া তার ড্রাগন ফলের বাগানটি গড়ে তোলেন।

“একবার আপনি ফল পেতে শুরু করলে, টানা সাত মাস ধরে ফল সংগ্রহ করতে পারেন, এবং প্রতি বছর ফল পাওয়া যায়, যা অন্য কোনো ফসল থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। এছাড়া, এটি একটি উচ্চ মূল্যের ফসল এবং মাত্র কয়েক মাসের মন্দা সময় ছাড়া সারা বছর ফল পাওয়া যায়,” গোলাপ মিয়া ড্রাগন ফল চাষের লাভের কারণ ব্যাখ্যা করেন।

বর্তমানে ড্রাগন বাগানের খরচ বাদ দিয়ে বছরে ১২ লাখ টাকা আয় করেন; গোলাপ মিয়া যা প্রতিমাসে প্রায় ১ লাখ টাকা; যা তার পূর্বের চাকুরির বেতন-এর দ্বিগুণ। শুধু তাই নয়, তিনি তার শ্বশুর ও অন্য একজনকে তার ড্রাগন বাগানে নিয়োগ দিয়েছেন। কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন আরো দুই জনের। তিনি বলেন, “আর চাকুরি হারানোর ভয় নেই, আমি নিজেই চাকুরি তৈরি করি। আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন আমি বেশি আত্মবিশ্বাসী ।”

দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায়

জেভিয়ার স্কু

ভূমিকা: এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর ২০২২ সালের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে ১৮.৭% মানুষ এখনও দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। আবার ২০২৩ সালের এডিবির তথ্য অনুসারে ৫.৮% চাকুরিজীবি মানুষের ক্রয় ক্ষমতা ২.১৫ ডলারের নিচে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের জন্য এই পরিসংখ্যান উদ্বেগজনক। কারণ সারাবিশ্ব যেখানে চাঁদ অথবা মঙ্গল গ্রহে বাসস্থান গড়ে তোলার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত সেখানে আমরা এখনও দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য লড়াই করে যাচ্ছি। তবে আশার বিষয় হলো, এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা নিরলসভাবে নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। তাদের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো বিভিন্ন উপায় বা পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। তার মধ্যে সাধারণ মানুষকে সমবায়ী করে তোলার উদ্যোগ অন্যতম। তাদের এই উদ্যোগ এবারের সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য ‘সমবায় সকলের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ তৈরি করে’ এর মূলসুরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলাদেশের মত দক্ষিণ আফ্রিকাতেও নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায় খাতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। তারা সফলও হচ্ছে।

সমবায় সমিতির যাত্রা: সমবায় সমিতির যাত্রা নানাভাবে শুরু হয়। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে সমবায় কার্যক্রম শুরু করে। আবার সমমনা সাধারণ মানুষ সংগঠিত হয়ে নিজেরা কোন কোন সমবায় সমিতি শুরু করে। তবে যেভাবেই শুরু হোক না কেন সকল সমিতিই সমবায় বিধিমালা অথবা গঠনতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত অথবা নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি পরিচালনা পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হয়। এই পরিচালনা পরিষদের সদস্যগণ সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হয়। সমিতির সদস্যদের শেয়ার আমানত ও সঞ্চয় নিয়মিত জমা দেয়ার মাধ্যমে সমবায় সমিতির তহবিল গঠিত হয়। পরবর্তীতে জমাকৃত শেয়ার আমানত-এর বিপরীতে একজন সাধারণ সদস্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যেমন শিক্ষা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, চিকিৎসা, ইত্যাদির জন্য ঋণ সুবিধা নিতে পারে। সমবায় সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন হয়রানির শিকার হতে হয় না।

সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য: সাধারণ মানুষ সমবায় সমিতি করতে আগ্রহী হয়, কারণ তারা মনে করে সমবায় সমিতিতে অংশগ্রহণ, অথবা সদস্য পদ নেয়ার মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের আয় রোজগার বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাদের ধারণা অনেকাংশে সঠিক। কারণ সমবায় সমিতি হলো একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে সাধারণ সদস্যরা সহজে বিনা হয়রানিতে ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ করে নিজের ও পরিবারের জন্য বাড়তি আয়ের যোগান দিতে পারে। আর এই ক্ষুদ্রঋণ পরিশোধ করা সাধারণ সদস্যদের জন্য সহজ। কারণ ঋণের কিস্তি ও সুদের পরিমাণ সহনশীল হয়ে থাকে। মূলত সমবায় সমিতি করা হয় যেন আপদকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় টাকার যোগান পাওয়া যায়। বিজ্ঞজনদের মতে, সমবায় হলো ‘দশের লাঠি একের বোঝা’। আপদকালীন সময়ে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানো।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা একটু অবতারণা করা প্রয়োজন বোধ করছি। আমি একটি সমবায় সমিতির সদস্য। সদস্য হই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সময় ১৯৯০ সালে। আমি প্রথম ঋণ নিয়ে একটি বাইসাইকেল ক্রয় করেছিলাম। সেটি বাহন হিসেবে ব্যবহার করতাম টিউশনি করার কাজে। গল্পটি বলার উদ্দেশ্য হলো এই সমিতি শুরু হয়েছিল সদস্যদের কাছ থেকে মুষ্ঠি চাউল জমা করার মাধ্যমে। এই সমিতির এখন কয়েক হাজার কোটি টাকা মূলধন বা তহবিল হয়েছে। এই সমবায় সমিতির সদস্য হয়ে অনেক দরিদ্র মানুষ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পেরেছে। অনেক ছাত্র/ছাত্রী বিদেশে উচ্চ শিক্ষা নিতে পারছে।

দারিদ্র্য নিরসনে সমবায় খাতের ভূমিকা: সমবায় খাত দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমবায়ীরা দেশের কৃষি, মৎস্য চাষ, পশু পালন, দুগ্ধ উৎপাদন, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, পরিবহন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, আবাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে। স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী নিবিড় পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা, প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সমবায়ীদের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করতে অনেক সমবায় উদ্যোগ নিচ্ছে। সাধারণ মানুষের জীবন মান উন্নয়নে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন করে অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে সমবায় খাতের অবদান অপরিসীম। অনেক সমবায় সমিতি বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের সফল সমবায় সংস্থাগুলোর সঙ্গে নিয়মিত অভিজ্ঞতা বিনিময় করে যাচ্ছে এবং অভিজ্ঞতাগুলো নিজের দেশে বাস্তবায়ন করছে এবং সফল হচ্ছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ ও দেশ গড়তে সমবায় অত্যন্ত গুরুপূর্ণত ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমি মনে করি। টেকসই লক্ষ্যমাত্রা SDG1 End poverty in all its forms everywhere এবং SDG 2 End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture অর্জন করতে সমবায় মূখ্য ভূমিকা পালন করবে যা দারিদ্র্যকে শূণ্যের কোঠায় নিয়ে আসবে।

Reference: 1. Bangladesh: Poverty - Asian Development Bank

সম্পাদক: কে এম রেজাউল হক, **প্রকাশক:** রাসেল আহম্মেদ লিটন কর্তৃক এসকেএস প্রিন্টার্স, গাইবান্ধা থেকে মুদ্রিত ও সাবেক বিজেএমসি ভবন, শনিমন্দির রোড, গাইবান্ধা থেকে প্রকাশিত। সার্কুলেশন: ০১৭০১৭৬৪৮৩০, e-mail: dailymadhukar@gmail.com